ধারাবাহিক রচনা

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর স্মৃতিচারণ

কণা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরদিন ২৮ জানুয়ারি। কলেজে স্পোর্টস ছিল, তাই বেরোতে একটু দেরিই হল। আজই তো পূজ্যপাদ মহারাজের সারগাছি অবস্থানের শেষদিন, তাই আমাদের মন খুব ভারাক্রান্ত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আশ্রমে পৌঁছে তিনটে নাগাদ পূজনীয় মহারাজের ঘরে ঢুকে প্রণাম জানালাম। তিনি তখন উপস্থিত একজন ভক্তকে জিজ্ঞেস করছিলেন কেমন করে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে পারেন। এইপ্রসঙ্গে পূজনীয় মহারাজ তাঁর নিজের জীবনের কথা বলতে লাগলেন :

''১৯০৪ সালে একদিন স্ট্র্যান্ড রোডে অবস্থিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়েছি। সেখানে ম্যাক্সমুলারের 'Life and Teachings of Sri Ramakrishna' বইটার সন্ধান পেয়ে স্লিপ দিয়ে বইটি আনিয়ে পড়তে শুরু করি। তখন ওখানকার লাইব্রেরিয়ান ছিলেন Mr. Macferlain। বইটি নাড়তে নাড়তে চোখে পড়ল, 'Dakshineswar is situated about 4 miles from Calcutta.'

''কলেজ স্ট্রিটে বহু খোঁজ করেও বইটার কোনও কপি না পাওয়ায় লাইব্রেরিতে গিয়ে বইটা কপি করে নিই। ইয়ংম্যান তখন, এনার্জি প্রচুর, তাই কিছু অসুবিধা হয়নি। তারপর বারবার বইটা পড়ে মনে হয়, এই তো হদিশ পাওয়া গেছে। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করে দিই। ওখানেই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। কী নির্জন! আর ঠাকুরের সময় যেমনটা ছিল, তেমনই আছে। মাঝে মাঝে রাত কাটাতাম। কখনও কখনও গৌরীমা আসতেন। আর রামলালদাদা তো তখন ওখানেই ছিলেন। সারারাত ভজন-কীর্তনে সময় যে কীভাবে কেটে যেত টেরই পেতাম না।

''দেখো, তখন কিন্তু মার কথা কিছু মনে হয়নি। সময় না হলে তো কিছু হয় না! অবশেষে সেই সময় এল। একদিন ওখানে বসে আছি, এমন সময় শরৎ চক্রবর্তী মহাশয় এসে রামলালদাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা কেমন আছেন?' তক্ষুনি মনে হল, তাই তো! মা তো আছেন, তিনি যদি একবার আমার মাথায় হাতটি রাখেন, তাহলে তো সব হয়ে যাবে।

''ব্যাস, অমনি চলে গেলাম মার কাছে। সেটা ১৯০৬ সাল। কিন্তু কলকাতার ছেলে তো, তাই কেবলই মনে হচ্ছিল, কেউ একজন সঙ্গে থাকলে হত। মায়ের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিত। যাহোক সাহস করে মায়ের বাড়ি ঢুকে পড়লাম।

''মা তখন বারান্দায় বসে তরকারি কাটছেন।

আমায় দেখেই বললেন, 'কেমন আছ বাবা? পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো?' আমি তো অবাক! কে বলল মা আমায় চেনেন না! এই তো দিব্যি চেনেন। তবে আর আমার ভাবনা কী?

''মাকে তখন বললুম, 'মা আমার মাথায় একটু হাতটি বুলিয়ে দিন। তাহলে আর আমার কোনও ভাবনা থাকবে না।' মা বললেন, 'বাবা আমি তোমায় দীক্ষা দেব।' বোঝো একবার ব্যাপারখানা। আমোদরের তীরে কোনও লোকজন নেই, সেখানে গিয়ে আমার সে কী নৃত্য! আর আমায় পায় কে!

''এর কিছুদিন পর—১৯০৭ সাল। মনে হল এবার বাড়ি ছাড়তে হবে। কিন্তু মনে ভয়, যদি ফিরে আসতে হয়! মঠে যেতে পারি না। ও বাবা! ঠাকুরের সব বড় বড় সন্ন্যাসী সন্তান, তাঁদের কাছে কে যাবে বাবা! তাহলে কী হবে? আচ্ছা, মা-ই তো বলতে পারেন আমার সময় হয়েছে কি না। সব ঠিক করে মায়ের কাছে চলে গেলাম। তখন মনে বড় বড় আইডিয়া। ভারতবর্ষের বড় বড় তীর্থ সব পায়ে হেঁটে ঘুরব। তারপর কোনও এক নির্জন স্থানে স্থির হয়ে বসে ধ্যানভজনে দিন কাটিয়ে দেব। তখন কি আর জানি মার মনে কী আছে!

''মাকে সব বলতে মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, এখানে এক মাস থাকো, তারপর বলব।' আহা! কী আনন্দেই না সে-দিনগুলো কাটিয়েছিলুম! কিছুদিন পর মা বললেন, 'না বাবা, তোমাদের অত কঠোর করার দরকার নেই। সে যারা করে করুক। তবে ইচ্ছে হয়েছে, আমি এখান থেকে কাশী পর্যন্ত হেঁটে যাবার অনুমতি দিলাম।'

''মা নিজের হাতে গেরুয়া দিলেন। সেই যে ধরেছিলেন, আর ছাড়েননি। এখনও ধরে রয়েছেন। দেখছ না, এখনও এত বয়স পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ কী ঘোরান-ই না ঘোরাচ্ছেন! না হলে আমার কী ক্ষমতা বলো? মা না ধরে রাখলে এমন হয়? মা-ই তো সব করাচ্ছেন।''

বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা সকলে হলঘরে জড়ো হলাম। 'সৎপ্রসঙ্গ' থেকে 'কেবল তাঁকে ধরো'—এই অধ্যায়টি পড়া হল। পূজনীয় মহারাজ এরপর বলতে থাকলেন :

''ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। তিনি সবারই ডাক শোনেন, তাঁর চক্ষু রয়েছে সব দিকে, তিনি যে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'। তাঁর চৈতন্যে আমরা চৈতন্যময়। যা কিছু করি, সব তো তিনিই করান। আমরা কেবল মায়ায় ভুলে নিজেই করছি মনে করি। অর্জুন ভক্ত, তাই তাঁর প্রতি ভগবানের কী ভালবাসা! তাঁকে বলছেন, তোমায় গুহ্যতম কথা একটি বলছি— 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' দেখো, কী ভালবাসা! ভক্তের হিতের জন্য উপায় বলে দিচ্ছেন। এইরকম ভক্ত হতে হবে।

''ঠাকুর বলতেন, ভক্ত সুঁচ আর ভগবান চুম্বক। তবে তাঁর সঙ্গে যোগ হচ্ছে না কেন? সুঁচে যে কাদা মাখানো রয়েছে! এই কাদা ধুয়ে ফেলার জন্যই তো সাধন ভজন দরকার।

''সময়ে সময়ে আবার ভগবান নিজে সুঁচ হয়ে ভক্তের প্রতি আকৃষ্ট হন। বলছেন, 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।' তাহলে উপায় কী? উপায় নিজেই বলে দিচ্ছেন—'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।' রামপ্রসাদ বলছেন—মায়া ঠুলি, সংসার ঘানি। কিন্তু আমাদের কী সাধ্য এর হাত থেকে মুক্তি পাই! ঠুলি যিনি পরিয়েছেন তিনিই সময়মতো খুলে দেবেন। আমরা শুধু টানাটানিই করতে পারি মাত্র।

''কাজেই শরণাগত হও। শরণাগত হলে দিব্যচক্ষু লাভ হয়। যেমন হয়েছিল অর্জুনের। তোমার প্রয়োজন শুধু শরণাগতি। With man it is impossible, but nothing is impossible with God. কোটি জন্মের সংস্কার যাওয়া সহজ

নয়। তাই প্রয়োজন শরণাগতি, প্রয়োজন পুরুষকার।

''ঠিক কুকুরের মতো তাঁর দরজায় পড়ে থাকতে হবে। এটাই তো পুরুষকার, তারপর কৃপা আসবেই। পড়ে থাকতে দেয় না আমাদের সংস্কার—'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি'। কিন্তু চেষ্টা তো করতেই হবে, উদ্যম চাই। তুমি যে-অবস্থাতেই থাকো, তাঁর দরজায় পড়ে থাকো। তবে তো তিনি ধুয়ে মুছে সাফ করে নেবেন! মা যেমন পরিষ্কার করেন ছেলেকে। ছেলে তো নিজে নিজে কিছু করে না, সে শুধু মা-মা বলে ডাকে। কাঁদে। তোমাকেও তাঁর কাছে পবিত্র হয়ে যেতে হবে না, যা করবার মা-ই করে নেবেন। তুমি শুধু একান্তভাবে তাঁর শরণাগত হও। এটা তাঁর গুহ্যতম উপদেশ। আবার দেখো, বলছেন একদম অযাচিতভাবে। তাঁর কী অপার করুণা ভাবো!

''বেড়ালছানার মতো হয়ে যাও। পাণ্ডবদের কী শরণাগতি! তাঁদের মতো অনন্যশরণ হতে পারলে ভগবান সব ভার নেন বই কী! ঠাকুর বলছেন, 'তুমি এক পা এগোলে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন।' গীতাতেও সেই একই কথা—আমাকে প্রীতিপূর্বক ভজনা করলে, আমি তোমার সব ভার বহন করব।

''তুমি মাঝি হয়ে দাঁড় টেনে যাও, তাঁর কৃপা-বাতাস পালে এসে লাগবেই। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন, 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।/ দদামি বুদ্ধিযোগং তম্...।' এই সদ্‌বুদ্ধি দ্বারা ঘটে তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ। আমাদের রাজসিক বুদ্ধিতে কেবলই হয় বিয়োগ। তাই চাই বিবেকবুদ্ধি। আবারও বলেছেন, 'আমি শুধু বুদ্ধিযোগই দিই না। অহংবুদ্ধিও নাশ করি। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।' আমি জীবের সমস্তরকম মায়া-মোহ নাশ করি। শরণাগতি মানে দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি সব নিঃশেষে তাঁর চরণে সমর্পণ করা—একেবারে 'সর্বভাবেন'।

''আবার বলছেন, 'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিম্।' আমরা খুঁজছি কোথায় শান্তি। ভুল করে ভাবছি, জমি-জরু-টাকায় বুঝি আছে সেই শান্তি। কিন্তু দৃষ্টি ফেরাতে হবে ভেতরে। এটাই পুরুষকার—তারপরই 'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।' কৃপাবাদটা কীরকম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন!

''তাঁর কৃপা ছাড়া এই মায়া পার হওয়া যায় না। এ কি সোজা ব্যাপার নাকি! আমরা শান্তি খুঁজি বাইরে—তাই তো ভগবান বলেছেন, আমি কৃপা করে আমার স্বরূপটি তোমায় জানিয়ে দেব।

''ভগবানলাভ করলে আর জন্ম হয় না। কিন্তু শুধু পুরুষকার দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় না। তবে উদ্যম দেখলে তিনি কৃপা করেন। তাঁর শরণাগত হওয়া চাই। আবার এই শরণাগতি হওয়া চাই 'সর্বভাবেন'। ঠাকুর যাকে বলেছেন—মন-মুখ এক করে, বলেছেন—ভাবের ঘরে চুরি না করে।

''এই মন-মুখ এক করার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে রসিক মেথর। ঠাকুরকে দেখে রসিকের মনে চলত দ্বন্দ্ব। তার ইচ্ছা হয় ঠাকুরের কাছে যায়। কিন্তু সে যে মেথর—কী করে তাঁর কাছে যাবে! ঠাকুর তার কত কাছে, অথচ কতই না দূরে! সে দেখে কতজন আসে ঠাকুরের কাছে, যখন তারা ফিরে যায়, আনন্দে ভরপুর হয়ে ফেরে, যেন কতই না ধনসম্পদ পেয়েছে সব। দেখে দেখে তারও ইচ্ছা হয়—ঠাকুরকে একদিন ধরতে হবে। তার অন্তরে ঝড় বইত। একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছেন। রসিক আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। 'আমার কী হবে'—বলে সোজা শুয়ে পড়ে ঠাকুরের দুটি পা জড়িয়ে ধরল। দেখো, রসিকের এই যে শরণাগতি, এ একেবারে 'সর্বভাবেন'। ঠাকুর ওই অবস্থায় এক ঘণ্টা সমাধিস্থ রইলেন। তারপর বললেন, 'যা তোর সব বন্ধন মুক্ত করে দিলুম।'

''দেখো, গীতার সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল! এঁরা ভগবান, যুগে যুগে আসেন। এঁরা ইচ্ছামতো

মানুষের মন ভাঙতে গড়তে পারেন।

''পুরুষকার চাই-ই চাই। ভারটি তাঁকে দিতে হবে। যত দেবে তত পাবে। কম দিলে কম পাবে। সংসারে আমরা সব দিয়ে ফকির হয়ে যাই। ভগবানকে কতটুকু দিই? সংসারে ষোলো আনা দিয়েও কি মন পাও? সংসারে সহস্রটা গুণ থাক, একটি দোষ থাকলেই তোমায় কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু ভগবান কোনও দোষ দেখেন না। তুমি এক পা এগোলে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন নিজে।

''তফাত এখানেই। এটাই ভগবদ্‌দৃষ্টি আর মনুষ্যদৃষ্টির মধ্যে প্রভেদ। উদ্যম করে তাঁর দরজায় পড়ে থাকতে হবে। তখন তিনি নিজে এসে তুলে নেবেন। পুরুষকার থাকলে তাঁর কৃপা হবেই। দৈব আর পুরুষকার সম্বন্ধে একটা গল্প শোনো।

''দুটি পাখি পাহাড়ে এক গুহায় বাস করে। সেই পাহাড়ের কিছু অংশ সামনের সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। একদিন পাখি দুটি আহার সংগ্রহ করতে গুহার বাইরে দূরে গেছে। ফিরে এসে দেখে তাদের চারটি ডিম সমুদ্রের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সমুদ্রের ওপর তাদের খুব রাগ হল, দুঃখও হল খুব। তারা প্রতিজ্ঞা করল সমুদ্রের ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে, সমুদ্রকে শোষণ করবে। সে কী! দুটি ছোট্ট পাখি, তারা কেমন করে সমুদ্রশোষণ করবে? তাদের কিন্তু দারুণ প্রতিজ্ঞা। প্রতিবেশীরা তাদের শান্ত করার চেষ্টা করে, বলে, 'আমাদেরও তো কত ডিম ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সমুদ্রের সঙ্গে কি আমরা লড়াই করতে পারি?' কিন্তু এই পক্ষিদম্পতির দারুণ প্রতিজ্ঞা। সমুদ্র শোষণ তারা করবেই। তারা বারবার সমুদ্রের ধারে যায়, এক ফোঁটা করে জল ঠোঁটে করে এনে বালিতে পাড়ে ফেলে দেয়। আবার যায়। সারা দিনরাত ধরে তারা এই করে চলেছে। চারদিন পর আর তো তাদের শরীর চলে না। অনাহারে, অনিদ্রায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে তারা শ্রান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তবু কিন্তু তারা তাদের প্রতিজ্ঞারক্ষায় ক্ষান্ত হয়নি, সমুদ্রশোষণের চেষ্টা করেই চলেছে।

''এইসময় আকাশপথে গরুড়বাহনে বিষ্ণু যাচ্ছিলেন। পক্ষিদম্পতির এই কাজ দেখে তিনি গরুড়কে পাঠালেন কী ব্যাপার খোঁজ করতে। গরুড় খোঁজ নিয়ে এসে বিষ্ণুকে বলায়, তিনি তাদের পুরুষকারের প্রশংসা করে গরুড়কে তাদের সাহায্য করার নির্দেশ দিলেন। সমুদ্র তখন ভীত হয়ে সোনার থালায় করে তাদের চারটি ডিম ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

''দেখো, পুরুষকার আর দৈবের কী অদ্ভুত সংযোগ! 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।' উদ্যোগ থাকলে তাঁর কৃপা আসবেই। কাজেই সাধন করনা চাহিরে মনোয়া প্রেম লাগানা চাহি। শুধু বাইরে জপ করলে কী হবে? আসলে মন-প্রাণ দিয়ে বলা চাই। মন-মুখ এক করে তাকে ডাকতে হবে। তবে তো তিনি আসবেন!''

পূজ্যপাদ মহারাজজীর পূতসঙ্গলাভে আমরা আনন্দে ভরপুর। আবার কবে এই সুবর্ণসুযোগ আসবে জানি না। জানি না, এই অমূল্যপ্রাপ্তি আমরা কতখানি আত্মস্থ করতে পারব। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আকুল প্রার্থনা জানালাম :

''কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে॥''

পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে চললাম বহরমপুর। *(সমাপ্ত)* ✠